দিঘির ঝামেলা

প্রচেত গুপ্ত

দিঘি ঝামেলায় পড়েছে। জটিল ঝামেলা। সুন্দরী, বুদ্ধিমতী দিঘি সিদ্ধান্ত নিয়েছে, অনেক হয়েছে, আর নয়। ঝামেলা এবার মেটাতে হবে। যে করেই হোক, মেটাতে হবে।

ঝামেলা মানেই মনের ভিতর খচখচানি। 'খচখচানি মন' ডেঞ্জারাস জিনিস। সব কাজ পণ্ড করে দেয়। লেখাপড়া থেকে আড্ডা, আড্ডা থেকে সিনেমা, সিনেমা থেকে গান, গান থেকে বই, বই থেকে ফেসবুক, ফেসবুক থেকে দিনে একবার করে মায়ের সঙ্গে ঝগড়া, ঝগড়া থেকে ভাব, ভাব থেকে রাতে খেতে বসে বাবার কাছে নানা আবদার, সবসময় মন খচখচ করতেই থাকে। কোনও কাজ ঠিকমতো করা যায় না। করতে পারছেও না দিঘি।

ঝামেলা মেটাতে হবে।

সেদিন ক্লাসে ফিজিক্স ম্যাডাম বললেন, "তোমার কি কোনও সমস্যা হয়েছে দিঘি?"

দিঘি কাঁচুমাচু মুখে উঠে দাঁড়াল। ফিজিক্স ম্যাডাম আর বি, রুক্মিনী বসু। দেখতে নরম-সরম, স্বভাবে কড়া। অমনোযোগী ছেলেমেয়েদের ক্লাস থেকে বের করে দেওয়া তার বিশেষ পছন্দ। বের করার সময় মিষ্টি হেসে চিমটি দিয়ে কথা বলেন, "ক্লাসে তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে, খাঁচায় বন্দি পাখি। ছটফট করছ। আমার এটা পছন্দ নয়। পাখি কেন বন্দি থাকবে? সে থাকবে আকাশে।

যাও, তুমি মুক্ত।" কলেজের থার্ড ইয়ারে ক্লাস থেকে বের করে দেওয়া অপমানের। দিঘি অপমানের জন্য তৈরি হল। আমতা-আমতা করে বলল, "না, ম্যাডাম, কোনও সমস্যা হচ্ছে না।"

আর বি বললেন, "অবশ্যই হচ্ছে। অনেকক্ষণ থেকেই দেখছি তুমি উসখুস করছ। আমার লেকচারে মন নেই। তুমি কি বলতে পারো সাউন্ডের কোন অংশটা নিয়ে আমি এতক্ষণ বলছিলাম?"

বলার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। সত্যি সে ম্যাডামের লেকচার শোনেনি। কী করে শুনবে? সেদিনই যে সে পরপর দু'টো চিঠি পেয়েছিল। একটা মেলে চিঠি, একটা মোবাইল চিঠি। একটা দেখেছে কলেজে আসার আগে, কম্পিউটার অফ করতে গিয়ে। আর মোবাইলের মেসেজটা এসেছে ক্লাসে ঢোকার ঠিক আগে। দু'টো চিঠিই এক লাইনের। কিন্তু তাতেই যা ঝামেলা হওয়ার, হয়ে গিয়েছে। দিঘি শাস্তির জন্য তৈরি হল। মাথা নামিয়ে বলল, "সরি ম্যাডাম।"

আর বি একটু চুপ করে থেকে বললেন, "আমি জানতাম তুমি পারবে না। দিঘি, তুমি লেখাপড়ায় যথেষ্ট ভাল। তোমার মতো বুদ্ধিমতী স্টুডেন্ট যদি ক্লাসে মন না দেয়, সেটা আমার মতো টিচারের পক্ষে সমস্যার হয়।"

দিঘি লজ্জা পেল। ক্লাস থেকে বের করে দেওয়ার চেয়ে বেশি লজ্জা। কড়া ম্যাডাম এমন স্নেহভরা বকুনি দিলে লজ্জা পাওয়ারই কথা। কিন্তু উপায় কী? সে তো আর ইচ্ছে করে উসখুসানি করেনি। এর জন্য তার ঝামেলা দায়ী।

শুধু ক্লাসে নয়, সমস্যা হচ্ছে বাইরেও। বন্ধুদের সঙ্গেও একই কাণ্ড। সেদিন ক্যান্টিনে সৃজা সিনেমার গল্প বলছিল। সৃজার এই এক বিচ্ছিরি স্বভাব। যে সিনেমা দেখবে, বন্ধুদের ধরে-ধরে শোনাবে। এই অভ্যেস ত্যাগ করার জন্য সৃজাকে অনেকবার বলা হয়েছে। শুধু গল্প নয়, বিভিন্ন ধরনের রোমাঞ্চকর দৃশ্যের কথাও বলে ফেলে মেয়েটা। কোনও এক সিনেমার হিরে হেলিকপ্টার থেকে দড়িতে ঝুলে হিরোইনকে চুমু খেয়েছে, সেটাও বলে দিয়েছে। হিরোইন তখন বাড়ির ছাদে কাপড় শুকোতে দিচ্ছিল, অকস্মাৎ এই আকাশ চুম্বনে সে জ্ঞান হারায়। কোনও সন্দেহ নেই ঘটনা টান-টান উত্তেজনার। এই উত্তেজনার আগে ফাঁস করে দেওয়ার পর স্বাভাবিক তো সৃজাকে এই মারে কী সেই মারে। মারবেই। সিনেমাটা দেখার মজাই নষ্ট। এখন সিনেমার গল্প বলতে গেলেই বন্ধুরা সৃজাকে অ্যাভয়েড করে।

সৃজা মুখ কাঁচুমাচু করে বসে থাকে। দিঘির খারাপ লাগে। সে খানিকটা করুণা করেই মাঝেমধ্যে সৃজাকে সময় দেয়। সৃজাও খুব উৎসাহে গল্প শুরু করে। মাঝেমধ্যে পরীক্ষাও নেয়। দিঘি ঠিকমতো গল্প শুনছে কিনা সেই পরীক্ষা। সেদিন পরীক্ষায় ডাহা ফেল করল দিঘি। গল্প তো দূরের কথা, সিনেমার নামটাই মনে করতে পারল না। করবে কী করে? সৃজার দিকে তাকিয়ে থাকলেও তার মনে তো খচখচানি। খচখচানি মনে কানে কিছু ঢোকে না। সৃজা কাঁদো-কাঁদো মুখে বলল, "তুইও অন্যদের মতো হয়ে গিয়েছিস দিঘি! আমার কথা কানে নিস না?"

শুধু সিনেমার গল্প নয়, সিরিয়াস বিষয়েও ঝামেলা।

শনিবার সীমন্তিনী নিজের দুঃখের কথা বলছিল। কীভাবে তার মা তাকে সবসময় পাহারা দিয়ে রাখে সেই দুঃখ। স্কুলে তো বটেই, কলেজে ওঠার পরেও তার উপর কঠিন নজরদারি চলছে। বাড়ির বাইরে একা বেরনো দূরের কথা, ঘরের দরজা বন্ধ করে যে একটু ফেসবুক করবে, সে উপায় পর্যন্ত তার নেই। মা তেড়ে আসেন। ফেসবুকে চ্যাট করার সময় পাশে বসে আড়চোখে তাকান।

"সারাক্ষণ ঘটাঘট করে কী করিস?"

সীমন্তিনী বিরক্ত হয়ে বলে, "ফেসবুক। গ্রুপে কথা বলছি।"

সীমন্তিনীর মা অবাক হয়ে বলেন, "গ্রুপ! সে আবার কী?"

সীমন্তিনী বলে, "সে আছে। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এক-একটা গ্রুপে আলোচনা করা যায়। তুমিও করতে পারো।"

সীমন্তিনীর মা চোখ সরু করে বলেন, "আমি কী

বিষয় নিয়ে আলোচনা করব?"

সীমন্তিনী বড় করে শ্বাস ছেড়ে বলে, "মেয়েদের উপর মায়েদের গোয়েন্দাগিরি নিয়ে। তোমরা গোয়েন্দাগিরির নতুন-নতুন পথ বের করবে।"

এখানেই শেষ নয়। সীমন্তিনীর মা মাঝেমধ্যে টেবিল গোছানোর নাম করে মেয়ের ব্যাগ, বই-খাতায় তল্লাশিও চালান। সম্ভবত কারও চিঠিপত্র, ফোটো আছে কিনা খুঁজে দেখেন। মোবাইলে ফোন এলে হাজার প্রশ্ন, কে করেছিল? ছেলে না মেয়ে? মেয়ে হলে ঠিক আছে। ছেলে হলে কোন ছেলে। কলেজের গেটে গাড়ি নামিয়ে দেয়। আবার কলেজের গেট থেকে গাড়ি তুলে নিয়ে যায়। সীমন্তিনী তার এই মর্মস্পর্শী দুঃখের কথা বলতে-বলতে প্রায় কেঁদে ফেলল।

"দিঘি, তুই বল, আমি কী করব! আমি কি বাড়ি থেকে পালাব?"

দিঘি পড়ে মুশকিলে। সে কী বলবে? তার মাথায় তো কোনও কথাই ঢোকেনি। কোনও জবাব না দিয়ে সীমন্তিনীর দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। সীমন্তিনী বলে, "অমন মাছের মতো তাকিয়ে আছিস কেন? বল, আমি কী করব। বাড়ি থেকে পালিয়ে যাওয়া ছাড়া আমার আর অন্য কোনও পথ আছে?"

দিঘি স্মার্ট হওয়ার চেষ্টা করে। জোর করে হেসে বলে, "আর-একবার গোড়া থেকে বলবি সীমন্তিনী? প্লিজ্। আমি ঠিক মন দিয়ে শুনিনি। বাড়ি থেকে পালানোর ব্যাপার তো, মন দিয়ে না শুনে মতামত দেওয়াটা ঠিক হবে না।"

বন্ধুর এরকম একটা দুঃখের কথা যে কেউ মন দিয়ে শোনে না, সীমন্তিনী ভাবতেও পারেনি। সে কাঁধে ব্যাগ নিয়ে দিঘির সামনে থেকে তখনই উঠে যায় এবং তিনদিন কথা বন্ধ রাখে। কলেজের ক্লাস বা বন্ধুদের সঙ্গে নয়, খচখচানি মনের জন্য সমস্যা হচ্ছে বাড়িতেও।

মা সেদিন বলল, "তোর কী হয়েছে বল তো দিঘি! বললাম বেডরুম থেকে মোবাইলটা এনে দে, এক গেলাস জল এনে দিলি।"

দিঘি অন্যমনস্কভাবে বলল, "ভুল বুঝেছি।"

দিঘির মা বললেন, "ভুল বুঝেছিস! মোবাইল আর জল তো কাছাকাছি জিনিস নয়। ভুল বুঝবি কী করে?"

দিঘি চুপ করে যায়। না গিয়ে উপায় কী? মাকে তো বলা যায় না একটু আগেই তাকে পরপর দু'টো ফোন ধরতে হয়েছে। তারপরই মোবাইল আর জলে গুলিয়ে গিয়েছে। কিন্তু বেশিদিন এই জিনিস চলবে না। চললে শুধু মোবাইল আর জল নয়, জীবনটাই গুলিয়ে যাবে।

কিন্তু ঝামেলা দূর করার পথ কী?

পথের খোঁজে দরজা বন্ধ করে অনেক রাত পর্যন্ত চিৎ হয়ে শুয়ে রইল দিঘি। শুয়ে-শুয়ে সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে রইল। লাভ হল না। উঠে পড়ে খানিকক্ষণ পায়চারি করল। তাতেও লাভ হল না। দরজা খুলে পা টিপে রান্নাঘরে গেল, মা-বাবার ঘুম যেন না ভাঙে। কফি বানিয়ে খেল। কোনও লাভ হল না। তারপর ল্যাপটপ খুলে দু'টো ফোটো পাশাপাশি রেখে গালে হাত দিয়ে ভুরু কুঁচকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে

রইল। ঝামেলা আরও জড়িয়ে-মড়িয়ে গেল। আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়তে-পড়তে দিঘি বুঝতে পারল, সমস্যা একান্ত ব্যক্তিগত হলেও একা সমাধান অসম্ভব। পরামর্শ লাগবে। এ ব্যাপারে তো বড়দের পরামর্শ নেওয়া যাবে না, একমাত্র খুব কাছের বন্ধুর সঙ্গে কথা বলা যেতে পারে। শুধু 'কাছের' নয়, 'খুব কাছের' বন্ধু চাই, যারা বিষয়টার গুরুত্ব বুঝবে এবং পাঁচকান করবে না। প্রেমের কথা পাঁচকান করা যায় না। বিশেষত, ঝামেলার প্রেম তো একেবারেই নয়। ঘুমের আগে মনে-মনে দুই 'কাছের বন্ধু' নাম ঠিক করে ফেলল দিঘি। একজন কেমিস্ট্রির অরিত্র, অন্যজন আনন্দীদি। অরিত্রার সঙ্গে দিঘির সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। তবে ঘনিষ্ঠ বলে যে দিঘি তার সঙ্গে কথা বলবে এমন নয়। অরিত্রা প্রেমের ব্যাপারে ওস্তাদ একজন মেয়ে। তার হাত ধরে কতজনের যে 'প্রেম' হয়েছে, তা বলে শেষ করা যাবে না। কাউকে হাতেকলমে আলাপ করিয়ে দিয়েছে, কাউকে আলাপ করার জন্য উৎসাহিত করেছে। কখনও আবার বান্ধবী সেজে নিজেই গিয়ে আলাপ করেছে। দিঘির বিশ্বাস অরিত্রা সঠিক পরামর্শই দেবে। আর আনন্দীদি হল ঠান্ডা মাথার মানুষ। সাবধানীও বটে। আগুপিছু হিসেব করে চলে। কলেজ যাওয়ার আগে অরিত্রার বাড়ি গিয়ে হাজির হল দিঘি। বলল, "দরজাটা বন্ধ করে দে। গোপন কথা আছে।"

অরিত্রা বলল, "চল, কলেজে গিয়ে কথা বলি, ক্যান্টিনে বসে।"

দিঘি বলল, "না, তোর সঙ্গে আলাদা করে কথা বলতে গেলেই সকলের সন্দেহ হবে। ভাববে, আমি নিশ্চয়ই প্রেম নিয়ে প্রবলেমে পড়েছি।"

অরিত্রা খিলখিল করে হেসে বলল, "পড়েছিসই তো।"

দিঘি কড়া গলায় বলল, "দ্যাখ অরি, তুই যদি সিরিয়াস না হোস, তা হলে কিন্তু বলব না।"

"সরি, আমি মুখ গম্ভীর করেছি। এবার বল, কতদিনের কেস?"

দিঘি বলল, "বেশিদিন নয়। মাস দু'য়েক।"

অরিত্রা বলল, "বাপ রে বাপ, দু' মাস? সে তো অনেকদিন! ডেটিং কতবার হয়েছে? ইয়ে-টিয়ে কিছু করেছিস?"

দিঘি বলল, "আবার ফাজলামি?"

অরিত্রা বলল, "সরি, আর বলব না। নে বল ছেলেটার নাম কী?"

দিঘি একটু চুপ করে থেকে বলল, "ছেলেটা নয়, দু'টো ছেলে।"

অরিত্রা আঁতকে উঠে বলল, "অ্যাঁ, ক'জন বললি? দু'জন? বলিস কী রে দিঘি! আমি ঠিক শুনছি তো? তোর মতো শুড গার্ল একেবারে দু'জনের সঙ্গে প্রেম শুরু করেছে? আমি কিছু জানতে পারলাম না! কনগ্র্যাচুলেশন। ডাবল কনগ্র্যাচুলেশনস!"

দিঘি গম্ভীর গলায় বলল, "কনগ্র্যাচুলেশনের কিছু নেই। এখনও কারও সঙ্গে কিছু করছি না। আর সেটাই হয়েছে ঝামেলা। কীভাবে ঝামেলামুক্ত হব, জানতে তোর কাছে আসা।"

অরিত্রা বলল, "আমার মাথায় কিছু ঢুকছে না। খুলে বল ভাই।"

দিঘি বলল, "বেশি খুলে বলতে পারব না। চট করে মুল ঘটনা বলছি।"

অরিত্রা উত্তেজিত গলায় বলল, "তাই বল, আগে মুল শুনি, তারপর শাখাপ্রশাখায় যাব।"

দিঘি সংক্ষেপে ঘটনা বলল। ছন্দক আর স্নেহাল। ছন্দকের সঙ্গে আলাপ ফেসবুকে,

স্নেহালের সঙ্গে ছোটপিসির বাড়িতে, টুকলুর জন্মদিনে। টুকলু ছোটপিসির ক্লাস ফোরে পড়া নাতি।

ছন্দক ম্যানেজমেন্টের ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র। পড়া শেষ করে চাকরি নিয়ে বাইরে চলে যাওয়ার তোড়জোড় করছে। তার সঙ্গে দিঘির ঘনিষ্ঠতা হয়েছে ফেসবুকে। ফেসবুকের 'কেরিয়ার' গ্রুপে। এই গ্রুপে ছেলেমেয়েরা নিজেদের কেরিয়ার নিয়ে আলোচনা করে, ইনফরমেশন দেওয়া-নেওয়া হয়। সেখানে নানা আলোচনার ফাঁকে ছন্দক দিঘিকে ফট করে ভালবেসে ফেলেছে। দু'জনের দেখা হয়েছে কয়েকবার। লম্বা-চওড়া এই ছেলেটিকে দিঘির অপছন্দ হয়নি। ছন্দক খুবই প্র্যাকটিক্যাল মানুষ। মাটিতে পা দিয়ে চলে। বড় চাকরি, বাড়ি-গাড়ির স্বপ্ন দ্যাখে। এতদিন হাবেভাবে ভালবাসার কথা বলত। এক সপ্তাহ হল ছন্দক দিঘির কাছে উত্তর চেয়েছে। হ্যাঁ নাকি না? দিঘি কিছু বলেনি, শুধু বলেছে, এখনই এত তাড়া কীসের? ছন্দক বলেছে, "এটাতেই আমার আপত্তি দিঘি। কেরিয়ার নিয়ে যেমন পরিকল্পনা করতে হয়, জীবন নিয়েও তাই। আগে থেকে ভেবেচিন্তে এগোনো উচিত। সেক্ষেত্রে তোমার মতামত জরুরি।" দিঘি তারপরও চুপ করে থেকেছে। কিন্তু আর চুপ করে থাকা যাচ্ছে না। ছন্দক ক্রমশ চাপ বাড়াচ্ছে। 'হ্যাঁ' অথবা 'না' একটা কিছু সে শুনতে চায়। স্নেহালের সঙ্গে দিঘির ঘনিষ্ঠতা টুকলুর জন্মদিনের ফোটো নিয়ে। ঠিক ফোটো নিয়ে নয়, তা নিয়ে ঝগড়া করতে গিয়ে। ওই রোগাপটকা ঝাঁকড়া চুলের ছেলেটা ক্যামেরায় কী এমন একটা কায়দা করেছিল, কে জানে, দিঘিকে সব ছবিতেই মনে হচ্ছে, ঝগরুটে। ভুরু কোঁচকানো, নাক ফোলা। যেন ফোটোর মধ্যে থেকেই ঝগড়া করে উঠবে। পিসির বাড়িতে সেই ছবি নিয়ে এসেছিল স্নেহাল। দেখতে-দেখতে তাকে চেপে ধরে দিঘি।

"আমার ফোটো এভাবে তুলেছেন কেন?"

স্নেহাল অবাক হওয়ার ভান করে, "কীভাবে তুলেছি?"

দিঘি বলে, "সব ফোটোতেই মনে হচ্ছে, আমি ঝগড়া করছি। আমি একটা ঝগরুটে।"

স্নেহাল বলল, "আমাকে বলছ কেন? ক্যামেরাকে বলো। তা ছাড়া..."

স্নেহাল চুপ করে গেলে দিঘি কটমট করে বলল, "তা ছাড়া কী?"

স্নেহাল মুচকি হেসে বলল, "মানুষের চোখ মিথ্যে বলে, ক্যামেরা মিথ্যে বলে না।"

ব্যস, আগুনে ঘি পড়ল! দিঘি প্রায় তেড়ে যায় আর কী! ছোটপিসি কোনওরকমে দিঘিকে সামলায়। যাওয়ার সময় স্নেহাল চুপিচুপি দিঘিকে মোবাইল নাম্বার দিয়ে বলল, "ঝগড়া করতে ইচ্ছে হলে কোরো, আমি অপেক্ষা করব।"

সেই শুরু। মাঝে-মাঝে কথা, দু'-একবার বেরনো, একদিন সিনেমা দেখতেও গিয়েছে। স্নেহাল কেরিয়ার নিয়ে পাগল, কিন্তু তার ভাবনা অন্যরকম। সে ডকুমেন্টারি ফিল্ম বানাতে চায়। বিখ্যাত ডকুমেন্টারি পরিচালক হতে চায়। এর জন্য সে সবকিছু করতে রাজি আছে। যখন সে ডকুমেন্টারির কথা বলে, তখন যেন ঘোরের মধ্যে চলে যায়।

"দিঘি আমাদের দেশে যে কতকিছু নিয়ে ছবি তোলার আছে, তা তুমি ভাবতেও পারবে না। কী বিচিত্র প্রকৃতি, কত ধরনের মানুষ! সাবজেক্ট আমার মাথায় সারাক্ষণ কিলবিল করে। এই তো সেদিনই ভাবছিলাম, পাহাড়ি ঝরনার উপর একটা কাজ করব। হিমালয় জুড়ে যে কতরকম ফলস্ আছে। তারপর ধরো মরুভূমি। মরুভূমির যাযাবর মানুষেরা কীভাবে জীবনযাপন করে, তার উপরও একটা কাজ করার ইচ্ছে আছে। পড়াশোনা শুরু করেছি। কিন্তু সেসবই উপর-উপর ইনফরমেশন। আমি মরুভূমিতে তাঁবু খাটিয়ে ওদের সঙ্গে থাকতে চাই।"

দিঘি খুশি হয়, বলে, "করো না। সমস্যা কী?"

স্নেহাল চকচকে চোখে বলে, "করব তো বটেই। যেদিন চান্স পাব, ক্যামেরা নিয়ে বেরিয়ে পড়ব। পিছন ফিরে তাকাবই না। আমার কাছে

চাকরি, বাড়ি, গাড়ির কোনও ভ্যালু নেই দিঘি। শখটাই আসল। ডকুমেন্টারির জন্য টাকা জোগাড় হলেই আমি সন্তুষ্ট।''

স্নেহালের শখ দিঘিকে মুগ্ধ করেছে। চারপাশের বাঁধাধরা নিয়মের পাশে অন্যরকম।

টাকাপয়সার বাইরে তার একটা স্বপ্ন আছে। স্বপ্নটাকে ভালবেসে ফেলল দিঘিও। যদি কখনও সম্ভব হয়, ডকুমেন্টারি তৈরির কাজে স্নেহালের পাশে থাকবে। স্নেহাল কিন্তু একেবারে পাকাপাকিভাবে দিঘিকে পাশে চায়। সাতদিন আগে দুম করে দিঘিকে প্রপোজ করে বসেছে। বলেছে, ''চাপ নেওয়ার কিছু নেই, দিঘি। এক সপ্তাহ সময় নাও। তারপর তোমার উত্তর জানিও। হ্যাঁ বা না, যাই বলো, হাসিমুখে মেনে নেব।''

এই হল দিঘির ঝামেলা। জটিল ঝামেলা। দিনের কাজ, রাতের ঘুম কেড়েছে। ছন্দক, স্নেহাল দু'জনের কাউকেই তার অপছন্দ নয়। দু'জন দু'রকম। একজন থাকে বাস্তব জগতে, অন্যজন স্বপ্নে। দু'জনেই তাকে ভালবেসে ফেলেছে। আর সেটাই হয়েছে মুশকিল। কাকে 'হ্যাঁ' আর কাকে 'না' বলবে, কিছুতেই ভেবে পাচ্ছে না।

অরিত্রা বলল, ''দু'জনকেই হ্যাঁ বলে দে দিঘি।''

দিঘি বলল, ''ছিঃ, তুই আমাকে এত খারাপ মেয়ে ভাবিস? আমাকে ঠকাতে বলছিস?''

অরিত্রা দু'পাশে হাত ছড়িয়ে বলল, ''এতে ঠকানোর কী আছে? দু'জনকে একসঙ্গে ভালবাসা যায় না?''

দিঘি বলল, ''দু'জন কেন? দু'শোজনকেও ভালবাসা যায়। কিন্তু এটা তো আর সেই ভালবাসা নয়। ছন্দক আর স্নেহাল দু'জনেই আমাকে...'' দিঘি মাথা নামিয়ে বলল, ''আমার সঙ্গে প্রেম করতে চায়।''

অরিত্রা ধপাস করে নিজের খাটের উপর শুয়ে পড়ে বলল, ''এ তো স্বয়ম্বর সভা! নিজের মনের মতো বেছে নাও। আচ্ছা, দিঘি তুই নিজে কার প্রেমে পড়েছিস?''

দিঘি ঝুঁকে পড়ে অরিত্রার হাত ধরল। কাঁপো-কাঁপো গলায় বলল, ''ওটাই তো বুঝতে পারছি না। সে জন্যই তো ঝামেলা। প্রেম-টেম নিয়ে তো মাথা ঘামাইনি, দু'জনের সঙ্গেই বন্ধুত্ব। দু'জনকেই পছন্দ। কী যে করি! হাত গুটিয়ে চুপ করে বসে থাকব, তা পারছি না, সর্বক্ষণ মনের ভিতর খচখচ করছে।''

অরিত্রা এবার উঠে বসে বলল, ''আমার মতে, তুই স্নেহালতে হ্যাঁ বলে দে। ছেলেটা রোম্যান্টিক। নরমসরম। অনেকটা তোর মতো। তোর সঙ্গে ভাল ম্যাচ করবে। এই ধরনের ছেলেদের সঙ্গে প্রেম করলে মজা। ছন্দক ধরনের ছেলেগুলো বিরাট বোর। সারাদিন শুধু চাকরি, বাড়ি, গাড়ি নিয়ে পড়ে থাকবে। প্রেম করার সময় তুই হয়তো বললি, দ্যাখো, কী সুন্দর আকাশ! ছন্দক বলবে, আচ্ছা দিঘি, ফ্ল্যাটটা কোন তলায় কিনব? একুশ না ছাব্বিশ? রোম্যান্সে পুরো জল। তার চেয়ে তুই বরং স্নেহালের অ্যাসিস্ট্যান্ট হয়ে যা। ওর সঙ্গে পাহাড়, জঙ্গল, মরুভূমিতে ঘুরে-ঘুরে বেড়া। ওর ক্যামেরা ক্যারি করবি। যদি চাস, আমিও মাঝে-মাঝে তোর হয়ে প্রক্সি দিতে পারি।''

দিঘি হাসতে-হাসতে বন্ধুর পিঠে চড় মারল। তারপর দু'জনে মিলে সোজা কলেজে। কলেজে গিয়ে আনন্দীর সঙ্গে দেখা করল দিঘি। সব কথা জানিয়ে দিঘি বলল, ''এবার মাথা ঠান্ডা করে বলো আনন্দীদি।''

আনন্দীদি হেসে বলল, ''তুই কি অন্যের কথা শুনে প্রেমে পড়তে চাইছিস?''

দিঘি বলল, ''না, পরামর্শ চাইছি। সিদ্ধান্ত তো আমার।''

আনন্দী বলল, ''দূর পাগল! প্রেম কি মিটিং করে হয়? যাকে ভাল লাগে, তার সঙ্গে যাবি।''

''এটাই তো ঝামেলা। আমার যে... আমার যে দু'জনকেই ভাল লাগে। খুব বিপদে পড়ে গিয়েছি। লেখাপড়া, কাজকর্ম সব ডকে উঠেছে। তুমি হলে কী করতে বলো তো, আনন্দীদি?''

আনন্দীদি একটুও না ভেবে বলল, ''আমি হলে ছন্দককেই প্রেফার করতাম। নাইস বয়। একটা সময়ের পর উপার্জনটাই প্রধান বিষয়। দাখ দিঘি, ঝরনার জল খেয়ে আর মরুভূমির তাঁবুতে থেকে জীবন কাটবে না। ওসব ডকুমেন্টারিতেই থাকা ভাল। এই বয়সে ভুল করে বসলে সারাজীবন পস্তাতে হবে। আমি মাথা ঠান্ডা করে ভেবেই বলছি।''

বিকেলের আগেই কলেজ থেকে ফিরেছে দিঘি। বাড়িতে কেউ নেই। তার মন খারাপ লাগছে। সে কনফিউজড়। সাতদিনের সময়সীমা শেষ। ছন্দক আর স্নেহালকে যা বলার বলে দিতে হবে। মনের খচখচানি দশগুণ বেড়ে গিয়েছে। অরিত্রা আর আনন্দীদি দু'রকম পরামর্শ দিয়েছে। দু'টোই ঠিক। তবু দিঘির মনে হচ্ছে, দু'টোই ভুল। এ আর-এক নতুন ঝামেলা। নিজের উপর রাগ হচ্ছে দিঘির। কেন যে মরতে এই দু'জনের সঙ্গে পরিচয় হল? বেশ ছিল। আবার মনে হচ্ছে, পরিচয় না হলে এমন চমৎকার দু'টো ছেলেকে চেনাই হত না। এমন সময় ডোরবেল বাজল। কে এল? বাবা-মা? দরজা খুলে চমকে উঠল দিঘি। রক্তিমদা! স্কুলের বন্ধু কুট্টির দাদা। বাইরে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে গিয়েছিল। কবে এল? পড়া কি শেষ? শুধু চমকে উঠল না, বুকটাও ধক করে উঠল দিঘির। বুকের ধক করার গোপন কারণ আছে। গোপন আর ছেলেমানুষি কারণ। একটা সময় ছিল, যখন রক্তিমদার সঙ্গে দেখা হলে, কথা বললেই শরীর আর মনটা কেমন ঝিমঝিম করত। একবার বিরাট বোকামি করে বসল। তখনও স্কুল শেষ হয়নি। মনে এই ঝিমঝিম ভাব নিয়ে একদিন ফস করে একটা কবিতা লিখে ফেলল। হাবিজাবি কবিতা। ছেলেমানুষ বয়সের ক্রাশ। বোকামি এখানেই শেষ করেনি। রক্তিমদাকে কবিতাটা দেখাতেও গিয়েছিল, পারেনি। রক্তিমদাই এড়িয়ে গিয়েছিল। তারপর থেকেই খানিকটা লজ্জা, খানিকটা অপমানে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিল দিঘি। এমনকী, কুট্টির সঙ্গেও যোগাযোগ কমিয়ে দেয়। ফেসবুকে হাজার লোকের সঙ্গে কথা বলেছে, রক্তিমদাকে কখনও খোঁজেনি।

''কেমন চমকে দিলাম দিঘি?'' রক্তিম চোখ নাচিয়ে বলল।

দিঘি আমতা-আমতা করে বলল, ''তুমি... তুমি ... তুমি কবে এলে।''

রক্তিম দিঘির পাশ দিয়ে ঘরে ঢুকে পড়ল। দিঘিকে নকল করে বলল, ''আমি... আমি... আমি এখন এলাম। এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম, তাই ভাবলাম, দিঘিকে একবার দেখে যাই। কতটা লম্বা হয়েছে।'' গলা খুলে হাসতে লাগল রক্তিম। বসতে বলে দিঘি বলল,''বলো, কী খাবে? কফি করব?''

রক্তিম সোফায় গা এলিয়ে বসে বলল, ''কিছু না। মাসিমা নেই?''

দিঘি চকিতে চোখ তুলে বলল, ''কেউ নেই।''

রক্তিম ভুরু কুঁচকে বলল, ''মাসিমা থাকলে একটা কথা ছিল, তোমার হাতে কফি খাওয়া রিস্কের হয়ে যাবে। চিনির বদলে নুন দিয়ে ফেলতে পার।''

দিঘি বলল, ''ইস। দ্যাখো না খেয়ে। সেই কবে ছোটবেলায়...''

রক্তিম দিঘির দিকে তাকিয়ে একটু চুপ করে থাকল। বলল, ''চোখমুখ এমন থমথমে কেন, দিঘি? এনি প্রবলেম?''

দিঘি আড়চোখে তাকিয়ে হাতের চেটো দিয়ে মুখ মুছল। বলল, ''কই? না, না, কিছু হয়নি তো!''

''না হলেই ভাল।''

দিঘি আড়চোখে তাকিয়ে দেখল, রক্তিমদার চেহারাটা একটু তামাটে হয়ে গিয়েছে। নিশ্চয় বাড়ির বাইরে থেকে রোদে-জলে ঘুরছে ইচ্ছেমতো। তবে আরও যেন ভাল হয়েছে।

''তোমার পড়া কমপ্লিট, রক্তিমদা?''

রক্তিম দু'টো মুঠো করা হাত উপরে তুলে ঝাঁকাতে-ঝাঁকাতে বলল, ''হয়ে গিয়েছে। হয়ে গিয়েছে। শুধু পড়া কমপ্লিট নয় দিঘি। ক্যাম্পাসিং-এ আমি ভাল চাকরিও পেয়ে গিয়েছি। গুরগাঁওতে জয়েন করে তবে কলকাতায় এসেছি। কোম্পানি ফ্ল্যাট দিয়েছে। অফিস যাতায়াতের জন্য গাড়িও।''

দিঘি বলল, ''বাঃ! কনগ্র্যাচুলেশন।''

রক্তিম এবার সোজা হয়ে বসল। সিরিয়াস গলায় বলল, ''শুধু চাকরিতে আমি স্যাটিসফায়েড থাকতে পারব না, দিঘি। আনন্দে বাঁচতে গেলে শুধু চাকরি, গাড়ি, বাড়িতে আমার হবে না। ওগুলো যেমন চাই, তেমন আমার গানও চাই। চাকরি আমার প্রয়োজন, গানটা আমার প্যাশন। দু'টো মিলে হই-হই করে বাঁচব।''

দিঘি অবাক হয়ে বলল, ''গান!''

রক্তিম লজ্জা-লজ্জা মুখ করে বলল, ''হ্যাঁ, গান। কলেজে যেমন আমি পড়াশোনাও করেছি, তেমন গান-বাজনাও করেছি। ঠিক করেছি গুরগাঁওতে বাঙালি ছেলেমেয়েদের নিয়ে একটা গানের দল খুলব। ব্যান্ড।''

দিঘির মুখ দিয়ে কথা বেরোচ্ছে না। সে থমকে গিয়েছে। কেরিয়ার আর শখ-আহ্লাদ একসঙ্গে! এমনও হয়! হবে না কেন? এই তো সামনেই বসে আছে! ঝাঁকড়া, এলোমেলো চুল, তামাটে গায়ের রং, কালো টি-শার্ট পরা মানুষটা দু'টোই নিয়ে বসে আছে। মানুষ তো এমনই হবে। প্রয়োজনের জন্য শখ, ভালবাসাকে ছাড়বে না, তেমন উলটোটাও। শখ মেটাতে গিয়ে প্রয়োজনটাকে ডকে তুলে রাখবে না।

রক্তিম গাঢ় গলায় বলল, ''দিঘি, তোমার কাছে একটা জরুরি দরকারে এসেছি।''

দিঘি অস্ফুটে বলল, ''কী?''

রক্তিম বলল, ''হয়তো টেলিফোনেই বলতে পারতাম, কিন্তু আমি সামনাসামনিই বলতে চেয়েছিলাম... ভয় ছিল এই পাঁচ বছরে বাড়ি-টাড়ি বদলে ফেলেছ কিনা!'' একটু চুপ করে থেকে রক্তিমদা বলল, ''দিঘি, তোমার কি মনে আছে, তুমি আমাকে নিয়ে একটা কবিতা লিখেছিলে? মনে আছে?''

কান-মাথা ঝাঁ-ঝাঁ করে উঠল দিঘির। কী বলছে মানুষটা! সে কি ঠিক শুনছে? নাকি ঝামেলায় তার টেটাল এলোমেলো হয়ে গেল?

কোনওরকমে ঘাড় কাত করল দিঘি, ''আমি ওই কবিতাটা চাই দিঘি। আমি ওতে সুর দেব, প্লিজ...''

দিঘি অবাক হয়ে দেখল তার শরীর আর মনে সেই পুরনো ঝিমঝিম ফিরে এসেছে। পাঁচ বছর আগের অনুভূতি। এসব কি সত্যি ঘটছে? সে অস্ফুটে বলল, ''যাঃ, ওসব হাবিজাবি... ছেলেমানুষি ছিল...''

রক্তিম একটা হাত বাড়িয়ে দিঘিকে ছুঁল। ফিসফিস করে বলল, ''আমি এতদিন ছেলেমানুষিটাকে খুব যত্ন করে ক্যারি করে এসেছি। কাউকে বলিনি। তোমাকেও নয়, দিঘি। এবার আমি গান গেয়ে সকলকে জানাব। এই কথাটা বলতে আমি এসেছি। ভালই হল বাড়িতে কেউ নেই। নইলে হয়তো অন্য কোথাও গিয়ে... তুমি রাজি নও?'' দিঘি হাত সরিয়ে নিতে গিয়েও থমকে গেল। বিড়বিড় করে বলল, ''হ্যাঁ, রাজি।''

ছন্দক আর স্নেহালকে 'না' বলতে দিঘির একেবারে কষ্ট হয়নি এমন নয়, হয়েছে। তবে নিজের ডিসিশনে জীবনে একজনকে 'হ্যাঁ' বলতে পারার আনন্দ সব কষ্টকে মুছে দেয়। সব ঝামেলা দূর করে। 'ঝামেলামুক্ত' দিঘি এখন গান লেখা নিয়ে বিরাট ঝামেলায় রয়েছে।

ছবি: সৌভিক রায়